সংবাদ

0..076

তারিখ ... 17.10.84 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 4 ...

পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থী

জাগরী

শুধু ফেল করা বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হোক। এমন একটি আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন কয়েকজন এস, এস, সি, পরীক্ষার্থী। চিঠিটি ১১-১০-৮৪ তারিখে একটি সহযোগী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। চিঠিতে তারা জানিয়েছে চলতি বছরের ব্যর্থ পরীক্ষার্থীদেরকে আসছে বছর পুরনো সিলেবাসেই পরীক্ষা দিতে হবে বলে বোর্ডের ঘোষণা পাওয়া গেছে। পরীক্ষা আবার সব বিষয়েই দিতে হবে। কিন্তু সব বিষয়ে ফের পরীক্ষা দেয়াটা খুবই কষ্টের। যে ছাত্র যে বিষয়ে ফেল হয়েছে, তাকে কেবল সে বিষয়েই পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হলে তাদের প্রতি সুবিচার করা হবে। এ বিষয়ে পত্রলেখক ছাত্রবৃন্দ দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

চলতি বছর এস, এস,সি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি। সিলেবাসের আমূল পরিবর্তনই এর কারণ। কারণ যাই হোক, পরীক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য গুরুত্বপ্রাপ্য। এই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনুত্তীর্ণদের অধিকাংশেরই ভরাডুবি ঘটেছে ইংরেজী ও অঙ্কে অথবা এ দু'টোর একটিতে। ইংরেজীই আছে পয়লা নম্বরে। অন্যান্য বিষয়ে বেশ ভালো করেও এই দু' একটি বিষয়ের জন্যই অনেকের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।

অবশ্য এটা যে শুধু এ বছরের ব্যাপার, তা নয়। প্রতি বছরই এমন হয়। আর আর সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেয়েও ইংরেজী অঙ্কে অথবা এর মধ্যে একটিতে হোঁচট খায়। এক বিষয়ে ফেলের জন্যই সে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। পরের বছর আবার তাকে নতুন করে সকল বিষয়ের প্রস্তুতি নিতে হয়।

বিষয় যাই হোক, ফেল করলে তা ফেলই। তাকে পাস ধরা যায় না। কিন্তু ফেল করা বিষয়ের সংখ্যা অবশ্যই বিবেচনার দাবীদার। বিশেষত: পরীক্ষার্থীর পরবর্তী পরীক্ষার রূপ নির্ধারণের জন্য। যে পরীক্ষার্থী দশটির মধ্যে নয়টিতেই উতরে যায়, তাকে একটি মাত্র বিষয়ের জন্য আরও একটি বছর আটকে রাখা এবং ঐ একটি বিষয়ের জন্য বাদবাকী সব পাস করা বিষয়ের পাস বাতিল করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এমন করে বছর নষ্ট করাও সব ক'টি বিষয়েই ফের পড়তে বাধ্য করা মানবিক নয়। এ যুগপৎ অর্থ ও শক্তির ক্ষয়।

কিছুকাল আগেও কিন্তু এমন ছিল না। এই সতেরো আঠারো বছর আগেও এক বিষয়ে ফেল করলে এবং এগ্রিগেটে ন্যূনতম নির্দিষ্ট নম্বর থাকলে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হতো। কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার তারিখ তিন-চার মাসের মধ্যেই ফেলা হতো এবং কম্পার্টমেন্টালপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী উচ্চতর কোর্সে অগ্রিম ভর্তির ব্যবস্থা থাকতো। ফলে তার অনুত্তীর্ণ বিষয়ের ঘাটতি পূরণের সময় পরীক্ষার্থী পেতো এবং পরীক্ষায় পাস করলে চলতি সেশন ধরার সুযোগও পেয়ে যেতো। আবার ইচ্ছে করলে কম্পার্টমেন্টাল না দিয়ে পরের বছর সব পরীক্ষাই দিতে পারতো।

বর্তমানে শুধু ডিগ্রী পরীক্ষায় এমন সাপলিমেন্টারীর ব্যবস্থা আছে। এইচ, এস সি, এস, এস, সি তে এমন কিছু নেই। কী কারণে তা তুলে ফেলা হয়েছে, জানা নেই। হয়তো ক্রমবর্ধমান পরীক্ষার্থীর সংখ্যার চাপে বোর্ডগুলোর পক্ষে এস,এস,সি, এইচ, এস সি, পরীক্ষা নেয়ার পর কম্পার্টমেন্টাল জাতীয় খুচরো পরীক্ষা নেয়ার ফুরসুৎ কম হয়। এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে বোধগম্য নয়। শিক্ষার্থীর জন্য যে কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি শিক্ষানীতির পরিপন্থী।

একদিকে অহেতুক কালক্ষেপণ যেমন এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির রীতি, অন্যদিকে আবার শিক্ষার্থীর সামান্যতম নিরুপায় কালহরণেও ঘটে অনাসৃষ্টি। নীতিটি বিপরীতমুখী। ছাত্রছাত্রীদের 'ব্রেক অব স্টাডিজ' এখানে অসামান্য অপরাধ। বিরতি থাকলে উঁচু ক্লাসে ভর্তি করা ঝক্কির ব্যাপার। ঝামেলা স্কুল বদলির ক্ষেত্রেও। বদলিপত্র প্রদানের ও নতুন স্কুলে ভর্তির মধ্যে এক মাসের বেশী গ্যাপ হলেই 'ব্রেক' এর প্রতিবন্ধক। 'ব্রেক' ধরা হয় চাকরির বেলাও। পাসের বছরে ধারাবাহিকতা না থাকে যদি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়। 'ছেদ' এখানে সংশয়ের-যে সংশয় তার যোগ্যতাকে খাটো করে দেখতে শেখায়।

শিক্ষা এখানে ব্যয়বহুল এবং মানুষের আর্থিক সংকট নিদারুণ। এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটিয়ে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে তার শিক্ষাবর্ষের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সত্যি কঠিন। মাঝে মাঝে কিছুদিন চাকরি করে অর্থের সুরাহা করে পড়া চালানোর ব্যবস্থা অনেককেই করতে হয়। কিন্তু মুশকিল বাধে, তাতে একজন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তার নিশ্চিত হার হয়।

অথচ উন্নত বিশ্বের নিয়ম তা নয়। সে সব দেশে একজন মানুষের পক্ষে জীবনভর ছাত্র থাকা সহজ। এককালীন সব বিষয়ের পরীক্ষা দেয়ার বাধ্যকতা যেমন তার নেই, তেমনি নেই একসঙ্গে সকল বিষয়ে পাস হওয়ার অনিবার্য শর্ত। পরীক্ষার্থীর স্বাধীনতা আছে সময় ও সুযোগ মতোন এক বা একাধিক বিষয় ক্লিয়ার করার। এর ফলে ছাত্রের কাঁধে পরীক্ষা দুর্ভর হয়ে চেপে বসে না। প্রস্তুতি নিয়ে স্থির লক্ষ্যে পড়ালেখা করা সহজ হয়। শিক্ষার দ্বার তার জন্য কোনও অবস্থায়ই রুদ্ধ হওয়ার নয়। যুক্তরাজ্যের মিল্টন কিংস-এর 'ওপেন ইউনিভার্সিটির' কথাটি এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই ওপেন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার হয় না—প্রয়োজন হয় না পূর্বে অধীত শিক্ষাবর্ষের ধারাবাহিকতার। এই ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত। এখানকার কৃতী ছাত্র আপন যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন পেশায় এমনকি শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্যন্ত নিযুক্ত।

শিক্ষাদীক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শীর্ষ স্থানে যে সব দেশ, তার কোনওখানেই শিক্ষার পথ সংকুচিত করার পরিকল্পিত বন্দোবস্ত নেই। আমাদের দেশে একজন শিক্ষার্থীকে শৈশব থেকে শিক্ষাবর্ষের শেষ অবধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে হয়। কোনও এক স্তরে সে যদি বিফল যায়, তবে তার পরবর্তী পড়ার সুযোগে বিঘ্ন দেখা দেয়। এখানে একজন ছাত্রের জীবনে প্রথম ফাইন্যাল পরীক্ষা এস, এস,সি। এ পরীক্ষার দু'বছর পর এইচ,এস,সি। উচ্চতর শিক্ষার জন্য এ দু'টো পরীক্ষাই ছাত্রের জীবনের ভিত্তি ও নিক্তি। এ দু'টো পরীক্ষার প্রত্যেকটিই অনুষ্ঠিত হয় এক হাজার নম্বরের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে। এস, এস,সি'তে বিষয় থাকে আটটি এবং এইচ, এস, সি'তে পাঁচটি। (এইচ, এস, সি'তে বিষয়ের ব্যাপকতা বাড়ে)। এই দু'টো পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হয় প্রায় একমাস কাল ধরে। কখনও কখনও তারও বেশি সময় লাগে। এই সুদীর্ঘকাল একটি ছাত্রকে থাকতে হয় টেনশনের মধ্যে। কেননা পারিবারিক, শারীরিক, বৈষয়িক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, প্রাকৃতিক যে কোনও ধরনের তিলমাত্র বিপর্যয়ে তার পরীক্ষার ক্ষতি হবে এবং একটিমাত্র পেপারের বিপর্যয়েই তার পুরো পরীক্ষার বিপর্যয় ঘটবে। অর্থহীন হবে দীর্ঘকালের শ্রম, গচ্চা যাবে বিপুল অর্থ। কেবল যে পরের বছর আবার সব পরীক্ষা দিতে হবে, তা নয়। একটি বছরের বিড়ম্বনা তার সারা জীবনের তিলক হয়ে দাঁড়ায়—ছাত্র অনিয়মিত হয়ে চিহ্নিত হয়ে যায়।

যে সব দেশে নিয়ম-কানুন সুপ্রতিষ্ঠিত, সে সবখানে যে কোনও ধরনের অস্থিরতার জন্য ক্লাস স্থগিত থাকে না বা পরীক্ষার তারিখ পেছায় না, সে সব দেশে পরীক্ষার নিয়মে কোনও শুচিবাই নেই। নিয়ম নেই—সময়ের পরীক্ষা সময়ে না দিলে, সকল বিষয় একসঙ্গে পাস না হলে ছাত্রের ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়ে যাবে। ছাত্রের একটি পরীক্ষার মান তার সকল অতীতের সাফল্য প্রশ্নসাপেক্ষ ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে—নিয়ম নেই এমন কোথাও। নারীর সতীত্বের মতোন ছাত্রকে প্রতিটি অগ্নিপরীক্ষায় অতি-সফলতার পরিচয় দিতে হবে, নইলে তার সবই বিফলে যাবে, নিয়ম নেই তারও। একবারের বা একটি বিষয়ের ব্যর্থতা তার সারাজীবন ব্যর্থ করবে, এমন হয় না কোথাও। কিংবা পরীক্ষার ব্যর্থতাই তার জীবনের ব্যর্থতার কারণ হবে, স্বতঃসিদ্ধ নয় এও।

এমন না হওয়ার কারণ, পরীক্ষা আসলে চূড়ান্ত নিয়ামক নয়—যদিও তা ছাত্রের মেধার মান একটি বিশেষ স্তরে নির্ণয়ে সহায়ক হয়। ছাত্র জীবনে মানুষ অ-স্থির স্তর অতিক্রম করে। এ সময় তার মধ্যে ক্রমপরিবর্তন ও ক্রমবর্ধন। একটু একটু করে বিকাশের লগ্ন তখন। অধ্যয়ন, অনুশীলন, অনুসরণ তাকে পরিশীলিত করে। কেউ দ্রুত আয়ত্ত করে—কেউ ধীরে ধীরে। আই, কিউ, সকলের সমান নয়, এমনকি এর বিকাশের ধারাও সকলের এক রকমের নয়। 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' কথাটি এ কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য শুধু ব্যক্তিত্বেই হয় না—হয় ব্যক্তিত্ব গড়ার ক্ষেত্রেও। এ কারণেই দেখা যায় কারও স্কুল জীবনের ঔজ্জ্বল্য পরবর্তী জীবনে নিষ্প্রভ হয়ে যায় আবার কারও অতি সাধারণ স্কুল জীবনের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা পরবর্তী শিক্ষা জীবন অত্যুজ্জ্বল হয়। এমনকি এমনও হয় শিক্ষাজীবনে উল্লেখযোগ্য মান প্রদর্শন না করে কর্মজীবন পারদর্শিতার গুণে গৌরবময় হয়।

মানুষের জীবন অঙ্কের খাতা নয়। স্বাতন্ত্র্য আর সংকটে, দুর্যোগে আর বিপর্যয়ে জীবনের গতি বার বার ব্যাহত হয়। এ অনিবার্য সত্যকে শিক্ষাজীবনে বিশেষ করে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভুলে যাবার পথ নেই। সুস্থ, সহজ, সুন্দর, মানবসত্তা গড়তে চাইলে বাস্তবকে স্বীকার করতে হবেই।

পরীক্ষার জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই পরীক্ষা। পরীক্ষা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, মানুষই তার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করবে পরীক্ষাকে। পরীক্ষাকে অহেতুক জটিল করে একে ভীতিপ্রদ করে তোলায় আর যাই থাক, কৃতিত্ব নেই। এ সত্যটি আমাদের সংশ্লিষ্টদের অনুধাবন করতে হবে। পরীক্ষাকে পরীক্ষার্থীর জন্য স্বস্তিকর করে তোলার ব্যবস্থাটি জরুরী। ব্যবস্থাটি এমন হওয়া চাই যাতে পুরো সিস্টেমে পরীক্ষার্থীই প্রধান হয়—পরীক্ষার নয়।